UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ

DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

মার্চ-২০১০ March 2010

২২তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা Volume-XXII, No. III

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

সমান অধিকার সমান সুযোগ,সবার জন্য অগ্রগতি

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস

বিশ্বের অনেক দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়। এই দিন নারীর ক্ষেত্রে জাতীয়, জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি না করে তাদের অর্জনের স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটি হলো অতীতের সংগ্রাম ও সাফল্য দেখার জন্য পেছনে ফেরা এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নারীর অপেক্ষায় যে অনাহার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে তা দেখার জন্য সামনে তাকানোর দিন।

১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের সময় জাতিসংঘ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন শুরু করে। দু'বছর পর ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যা সদস্য দেশগুলো তাদের ঐতিহাসিক ও জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বছরের যে কোনো দিন পালন করবে। প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে গিয়ে সাধারণ পরিষদ শান্তি প্রচেষ্টা ও উন্নয়নে নারীর ভূমিকাকে স্বীকৃতিদান করেছে এবং বৈষম্যের অবসান ঘটানো ও নারীর পূর্ণ এবং সমান অংশগ্রহণের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপজুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মকাণ্ড থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রথম সূত্রপাত ঘটে :

১৯০০ : যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়। আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দল ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘটের সম্মানে দিনটির আয়োজন করে। ঐ ধর্মঘটে নারীরা কাজের পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

১৯১০ : সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কোপেনহেগেনে এক সভায় মিলিত হয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং নারীর সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনের প্রতি সমর্থন গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক ধরনের একটি নারী দিবস প্রতিষ্ঠা করে। ১৭টি দেশের ১শ'র বেশি নারীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মত অনুমোদনের মাধ্যমে

অভিনন্দিত হয়। উপস্থিত নারীদের মধ্যে ফিনল্যান্ডের সংসদে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত তিনজন মহিলা সদস্য ছিলেন। দিবসটি পালনের কোনো নির্ধারিত তারিখ স্থির করা যায়নি।

১৯১১ : কোপেনহেগেনে গৃহীত উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ১৯ মার্চ অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ১০ লাখের বেশি নারী ও পুরুষ সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। ভোট ও সরকারি পদে নিয়োগের অধিকার ছাড়াও তারা নারীর কাজ ও কারিগরি প্রশিক্ষণের অধিকার এবং কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান দাবি করে।

১৯১৩-১৪ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিবাদের একটা ব্যবস্থায় পরিণত হয়। শান্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে রুশ নারীরা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রোববার তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। ইউরোপের অন্যান্য স্থানে পরের বছর ৮ মার্চ বা তার কাছাকাছি তারিখে যুদ্ধের প্রতিবাদ বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংহতি জানাতে নারীরা সমাবেশের আয়োজন করে।

১৯১৭ : যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার নারীরা ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার (গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৮ মার্চ) 'রুটি ও শান্তির' জন্য পুনরায় প্রতিবাদ ও ধর্মঘটকে বেছে নেয়। চারদিন পর জার পদত্যাগ করেন এবং অস্থায়ী সরকার নারীর ভোটাধিকার প্রদান করেন।

শুরুর বছরগুলোর পর থেকে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমভাবে নারীর জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক নতুন বৈশ্বিক মাত্রা পরিগ্রহ করে। জাতিসংঘের চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলনের মাধ্যমে জোরদার হয়ে ওঠা ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন একটি বিষয়ে গিয়ে স্থির হয়, যা হলো ক্রমবর্ধমান হারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে নারীর অধিকার ও অংশগ্রহণের প্রতি সমর্থন গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক নারী দিবস হলো অর্জিত অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করার, পরিবর্তনের আহ্বান জানাবার এবং যেসব সাধারণ নারী তাদের দেশ ও সমাজের ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের সাহস ও সংকল্পের কাজগুলোকে সাড়ম্বরে তুলে ধরার সময়।

নারীর প্রতি সহিংসতা : সাড়াদানে জাতিসংঘ সংস্থাগুলো একযোগে এগিয়ে এসেছে

থোরায়া আহমেদ ওবাইদ

বিশ্বে সবচেয়ে ব্যাপক অথচ সবচেয়ে কম স্বীকৃত মানবাধিকারের অপব্যবহার-নারীর প্রতি সহিংসতার মূলোৎপাটনে পরিচালিত প্রচেষ্টার গতি জোরদার হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৭০ ভাগ নারী তাদের জীবনে কোনো না কোনো ধরনের দৈহিক বা যৌন সহিংসতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সব স্থানে সমাজ, সুশীল সমাজ ও সরকার নারীর স্বাস্থ্য, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বতন্ত্রতার জন্য ক্ষতিকর এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের ওপর নেতিবাচক অভিঘাত ফেলার চর্চাগুলোর অবসান ঘটানোর জন্য সমবেত হচ্ছে। এই প্রচেষ্টায় সহযোগীদের সমর্থনে জাতিসংঘ ব্যবস্থা একযোগে কাজ করছে।

পুরুষ নেতৃবৃন্দের নেটওয়ার্ক

২০০৯ সালের ২৪ নভেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন পুরুষ নেতৃত্বের নেটওয়ার্ক চালু করেছেন। এসব নেতা নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলে একটি প্রকাশ্য ভূমিকা নিয়েছেন। নেটওয়ার্কের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ব্রাজিলের ঔপন্যাসিক পাওলো কোয়েলহো, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী জোসে লুইস রডরিগজ জেপাতেরো, চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট রিকরডো লাগোস, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা কর্মব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সমউচ্চারিত দাবির সঙ্গে কণ্ঠ মেলাবেন।

এই নতুন নেটওয়ার্ক ২০০৮ সালে চালু করা নারীর প্রতি সহিংসতার অবসানে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য মহাসচিবের প্রচারাভিযান ইউনাইটের অংশ। এতে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার অবসানে সব দেশের প্রতি ২০১৫ সালের মধ্যে জোরালো আইন, বহু খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ, উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রণালিবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। অনেক দেশে নারী গ্রুপগুলো যে কাজ করছে তার ভিত্তিতে গতি সঞ্চার ও বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এটি জাতিসংঘ ব্যবস্থার একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

বিগত বছরগুলোতে নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলে আমরা সরকার, বেসরকারি

সংস্থা, নারী গ্রুপ, সামাজিক গ্রুপ ও অন্যান্য নেটওয়ার্কের জোরদার প্রচেষ্টা দেখতে পেয়েছি। আজকে সহিংসতার ধরন ও ব্যাপ্তি এবং নারী ও সমাজের ওপর এর অভিঘাত সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনি ও নীতি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দন্ড মুক্তির অবসান এবং যে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এ ধরনের সহিংসতাকে অব্যাহত থাকার সুযোগ দিচ্ছে। তার অবসানে আরো অনেক কিছু করতে হবে। আজ পর্যন্ত নারীর প্রতি সহিংসতা নীরবতার সংস্কৃতির মধ্যে বহুলাংশে লুকিয়ে রয়েছে। তিনটির মধ্যে একটি নারী হয় পিটুনি খাচ্ছে, যৌন সম্পর্কে বাধ্য হচ্ছে, না হয় অন্য কোনোভাবে অব্যবহারের শিকার হচ্ছে– অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন কারো দ্বারা যাকে সে চেনে এবং জানে। এসব লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতা থাকতে হবে এবং যারা বেঁচে যায় তাদের কথা শুনতে হবে ও সহায়তা দিতে হবে। ইউনাইট প্রচারাভিযান এবং অন্যান্য প্রচেষ্টা এই বিষয়কে ঘিরে বিদ্যমান নীরবতাকে ভঙ্গ করছে এবং নিশ্চিত করছে যে, নারীর প্রতি সহিংসতা কেবল নারীর কোনো বিষয় নয়, বরং তা একটা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ব্যাপক সাড়ার দাবি রাখে।

১০টি দিশারী দেশ

জোরালো রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদের সহায়তাপুষ্ট একটি ব্যাপক সাড়ার প্রতি সমর্থনদানে ব্যাপক ম্যান্ডেট এবং বহুবিধ সংস্থা নিয়ে জাতিসংঘ সুসজ্জিত।

> “জোরালো রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদের সহায়তা পুষ্ট একটি ব্যাপক সাড়ার প্রতি সমর্থনদানে ম্যান্ডেট ও বহুবিধ সংস্থা নিয়ে জাতিসংঘ সুসজ্জিত”

চলতি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জাতিসংঘ একটি সমন্বিত ও বিভিন্ন খাতভিত্তিক সাড়ার জন্য ১০টি দিশারী দেশকে চিহ্নিত করেছে। এসব দেশে বিশেষ করে আইন, পরিসেবার যোগান, প্রতিরোধ ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উদ্যোগ এবং সামর্থ্য সম্পর্কে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরূপণের ভিত্তিতে যৌথ কর্মসূচি গড়ে তোলা হয়েছে। আরো অনেক দেশেও প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জাতিসংঘ কর্মসূচি ছাড়াও নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক জাতিসংঘ ট্রাস্ট তহবিলের ১১৯টি দেশ ও অঞ্চলে সরকার, সুশীল সমাজ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে প্রায় ৩শ’ *উদ্যোগে* ৪ কোটি ৪০ লাখ ডলারের বেশি বিতরণ করেছে।

আমি জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের প্রধান। এ সংস্থা দিশারী দেশগুলো এবং তার বাইরে কর্মসূচিতে সহায়তাদানের মাধ্যমে এসব উদ্যোগের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত : উদাহরণ হিসেবে ইন্দোনেশিয়া ও হন্ডুরাসে নারীর সহিংসতার বিষয়গুলোর প্রতি সংবেদনশীলতার সঙ্গে সাড়াদানের জন্য পুলিশ ও ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; গুয়াতেমালায় কেবল জাতীয় ও স্থানীয় সরকারগুলোর মধ্যে উন্নত সমন্বয় ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, ভারত ও নেপালে সূচনা বিষয় হিসেবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সাড়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে সহযোগীরা একসঙ্গে কাজ করেছে এবং ক্যাম্বোডিয়ায় পারিবারিক সহিংসতা মোকাবেলায় ২০০৭ সালে একটি জাতীয় আইন গ্রহণ করা হয়েছে। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার সমাধান এখন দেশটির জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যার মধ্যে মিলেনিয়াম উন্নয়ন পরিকল্পনা ৩ অর্জন, লিঙ্গভিত্তিক সমতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক একটি সূচক রয়েছে। বিশ্ব পর্যায়ে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান চিহ্নিত করার জন্য জাতিসংঘ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ জোরদার করছে। নারীর প্রতি সহিংসতার অবসানে জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য প্রথম বৈশ্বিক ‘এক ধাপবিশিষ্ট সাইট’ হিসেবে ২০০৯ সালে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক একটি ডাটাবেজ চালু করা হয়েছে। এটা দণ্ডমুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সহিংসতাকে অনুমোদন বা প্রমার্জন করার মনোভাব ও গতানুগতিক ধারার অবসান ঘটাতে পারার মতো প্রতিশ্রুতিশীল চর্চা চিহ্নিত করার ব্যাপারেও সহায়ক হবে।

জাতিসংঘ তার অভ্যন্তরীণ লিঙ্গভিত্তিক কাঠামো রীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নের পর্যায়ে রয়েছে। কয়েকটি বর্তমান কাঠামোকে একটি একক গতিশীল জাতিসংঘ সভায় প্রতিস্থাপনের জন্য সাধারণ পরিষদের আহ্বানের ভিত্তিতে যেসব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে তা লিঙ্গভিত্তিক সমতা বৃদ্ধি এবং মেয়ে ও নারীর প্রতি সহিংসতা অবসানে আমাদের কাজকে উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করবে। সংঘাত পরিস্থিতিতে এটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেখানে সামাজিক সম্পর্ককে অবমানিত, অবদমিত বা ছিন্নভিন্ন করার জন্য নারী দেহ অনেক সময় রণক্ষেত্রে এবং ধর্ষণ যুদ্ধের একটা পদ্ধতিতে পরিণত হয়।

নিরাপত্তাকেন্দ্রিক সাড়া

২০০০ সালে ১৩২৫ সংখ্যক প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদ সংঘাত নিরসনে নারীর অন্তর্ভুক্তি এবং শান্তি বিনির্মাণে তাদের অপরিহার্য ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রথমবারের মতো নারীর ওপর যুদ্ধের অভিঘাতের বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগী হয়। ১৩২৫ সংখ্যক প্রস্তাব ১শ’র বেশি ভাষায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আট বছর পর ১৮২০ সংখ্যক প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদ স্বীকার করে যে, যৌন সহিংসতা নিরাপত্তার একটা সমস্যা। আর তাই এর প্রতি নিরাপত্তাকেন্দ্রিক সাড়ার প্রয়োজন।

২০০৯ সালে নিরাপত্তা পরিষদ দুটি প্রস্তাব, ১৮৮৮ ও ১৮৮৯ গ্রহণের মাধ্যমে সশস্ত্র সংঘাতের পরিস্থিতিতে নারী ও মেয়েদের প্রতি জবাবদিহিতার মাত্রা বৃদ্ধি করে, যাতে নারীর সুরক্ষা জোরদার এবং সংঘাত-পরবর্তী অবস্থায় শান্তি বিনির্মাণ থেকে তাদের বর্জনের বিষয়টির সুরাহা করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ এ বিষয়ের সমাধানে সঙ্গতিপূর্ণ ও কৌশলগত নেতৃত্বদানে একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগের জন্যও জাতিসংঘ মহাসচিবকে অনুরোধ করে। এ প্রস্তাবের সবগুলোই সংঘাত নিরসন, শান্তি স্থাপন ও শান্তি বিনির্মাণে নারীকে নিয়োজিত করা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা করা, সংঘাতে নারীর প্রতি সহিংসতারোধ ও সহিংসতা ঘটে গেলে তাদের সুরক্ষার একটা জোরালো কাঠামোর ব্যবস্থা করছে। 'ধর্ষণ এখনই বন্ধ করুন : সংঘাতে যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কার্যক্রম' শীর্ষক প্রচারাভিযান কার্যক্রমকে উদ্দীপ্ত করছে। সংঘাতে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সুশীল সমাজ, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সহযোগীর তৃণমূল পর্যায়ে উদ্যোগের সংখ্যা বাড়ছে।

এসব উদ্যোগে আমি উৎসাহবোধ করলেও আরো বেশি কিছু করার জরুরি প্রয়োজনকে স্বীকার করছি। নারীর প্রতি সহিংসতার অবসানকে সব পর্যায়ে অধিকতর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক উদ্যোগের প্রতি সমর্থনদানে আরো নিবিড় প্রয়াস। বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রয়োজন যেমন রয়েছে, তেমনি সম্পদের পর্যাপ্ত বৃদ্ধিরও রয়েছে আবশ্যকতা। ষাট বছরেরও বেশি আগে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ 'আমরা জনগণ', মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং নর-নারীর সমান অধিকারে বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এটা কেবল নারীর একটা বিষয় নয়। বিষয়টি প্রত্যেকের—পুরুষ ও ছেলের পরিবারের, সমাজের। এটা বৈশ্বিক ও জাতীয় উভয়েরই বিষয়। সাধারণ থেকে বিরল, গৃহীত থেকে অগ্রহণযোগ্য, দণ্ডমুক্তি থেকে বিচার, দুর্ভোগ থেকে সহায়তা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলব যেখানে নারীর প্রতি সহিংসতা অতীতের একটা বিষয় হয়ে থাকবে।

বিশ্ব পানি দিবস

৮ মার্চ

'পানি আমাদের সব উন্নয়ন লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু। আমরা যখন আন্তর্জাতিক কার্যক্রম দশকের মধ্য পর্যায়ে উপনীত হয়েছি এবং এ বছরের মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের অপেক্ষা করছি, তখন আসুন দরিদ্র, দুস্থ ও পৃথিবীর সব প্রাণীর জন্য আমাদের পানিকে আমরা রক্ষা ও স্থিতিশীলভাবে সদ্ব্যবহার করি।'

মহাসচিব বান কি-মুন
২২ মার্চ ২০১০
বিশ্ব পানি দিবসে প্রদত্ত বাণী

দিবসের প্রতিপাদ্য : সুস্থ বিশ্বের জন্য বিশুদ্ধ পানি

পানির গুরুত্বের পাশাপাশি পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এই সম্পদের পরিমাণকে তুলে ধরে জাতিসংঘ—পানি ২০১০ সালের পানি দিবসকে পানির গুণগত মান সম্পর্কিত প্রতিপাদ্যের প্রতি উৎসর্গ করছে।

বিশ্ব পানি দিবসে আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি যে, বিশুদ্ধ পানিই জীবন এবং পানির গুণ আমরা কীভাবে রক্ষা করি তার ওপর আমাদের জীবন নির্ভর করে। বিশ্ব পানি দিবস ২০১০ এবং এর প্রচারণার লক্ষ্য হলো :

পানি ব্যবস্থাপনায় পানির মানোন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে সুস্থ প্রতিবেশ ও মানবকল্যাণ স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পানির মান সমস্যার সমাধান, যথা– দূষণ রোধ, বিশুদ্ধ করা ও পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকার, সংগঠন, সমাজ ও ব্যক্তিবর্গকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে পানির মান সম্পর্কিত রূপরেখা তুলে ধরা।

মিঠা পানির গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং মিঠা পানি সম্পদের স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনার পক্ষাবলম্বনের মাধ্যমে প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস পালিত হয়।
প্রতি বছর বিশ্ব পানি দিবস মিঠা পানির একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে।

পটভূমি

মিঠা পানির গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য ১৯৯২ সালে রিওডি জেনিরোয় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সম্মেলনে (ইউএনসিইড) একটি আন্তর্জাতিক দিবস পালনের সুপারিশ করা হয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এতে সাড়া দিয়ে ১৯৯৩ সালের ২২ মার্চকে প্রথম আন্তর্জাতিক পানি দিবস হিসেবে নির্ধারণ করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বরের এ/আরইএস/৪৭/১৯৩ প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনের (ইউএনসিইডি) এজেন্ডা ২১-এর অধ্যায়ের ১৮ (মিঠা পানি) অন্তর্ভুক্ত সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতি বছরের ২২ মার্চকে বিশ্ব পানি দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যার পালন ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু হবে।
দেশগুলোর প্রতি জাতীয় প্রেক্ষিত অনুযায়ী যথোপযুক্তভাবে প্রকাশনা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রচার এবং সম্মেলন, গোলটেবিল আলোচনা, সেমিনার, পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং এজেন্ডা ২১-এর সুপারিশ বাস্তবায়নভিত্তিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মতো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষে বাঙালি সংস্কৃতি কেন্দ্র ও ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আলোচনা, কবিতা পাঠ ও আকৃতি

২১ মার্চ ২০১০

গত ১১ মার্চ বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষে বাঙালি সংস্কৃতি কেন্দ্র ও ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি সেমিনার কক্ষে এক আলোচনা, কবিতা পাঠ ও কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হয়। কবি মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন। বিশ্ব কবিতা দিবসের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি হাবিবুল্লাহ সিরাজী ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাঙালি সংস্কৃতি কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক কবি আসলাম সানী। অনুষ্ঠানে ইউনেস্কো মহাপরিচালকের বাণী পাঠ ও বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশের ৩০ জনেরও বেশি নবীন-প্রবীণ কবি ও আবৃত্তি শিল্পী কবিতা পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি করেন।

কবিতা দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথি ও কবির সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা (সর্ব ডানে)

বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন

২২ মার্চ ২০১০

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে এনজিও ফোরাম, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ডব্লিউ এসপি যৌথভাবে প্রেসক্লাব অডিটোরিয়ামে এক কনসালটেশন সেমিনারের আয়োজন করে। জনাব মো. নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ড. এম ফিরোজ আহমেদ। সেমিনারে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, সরকারি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব সঞ্চালন করছেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শ্যামল দত্ত

জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করছেন মো. মনিরুজ্জামান

বিশ্ব কবিতা দিবস ২০১০

বিশ্ব কবিতা দিবস

কাব্যিক বৈচিত্র্য অন্য এক ধরনের সংলাপ সৃষ্টি করে। এই বৈচিত্র্য আমাদের কাছে প্রতিভাত করে যে, বিশ্বের সব স্থানের সব ব্যক্তিমানুষ একই প্রশ্ন ও একই অনুভূতির ভাগীদার। এটা আমাদের স্বাধীনতার একটি বৈশিষ্ট্য, এটা তাই যা আমাদের মানুষ করে তোলে। অতএব মানসম্মত শিক্ষা কর্মসূচিতে কবিতার একটা যথোচিত স্থান থাকতে হবে। সর্বজনীন কাব্যভুবনে বিচরণের মাধ্যমে তরুণজন অন্যকে অনুধাবন করতে এক অতিরিক, ভিন্ন, সূক্ষ্ম ও চপল যানে আসীন হওয়ার সুবিধা পেতে পারে। নতুন একটি কবিতার আবিষ্কার ভৌগোলিক দূরত্ব নির্বিশেষে অন্যের ভাষা, ভাবাবেগ ও সংবেদনশীল তার ভেতর একটি সাহসী যাত্রা।

আইরিনা বোকোভা
ইউনেস্কো মহাপরিচালক
বিশ্ব কবিতা দিবসে বাণী
২১ মার্চ ২০১০

আমাদের শব্দ ও জিনিসের ব্যবহার, এ বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধ ধারণা ও অনুধাবনের ধরন সম্পর্কে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সৃজনশীল বৈচিত্র্যে অবদান রাখে কবিতা। অনুষঙ্গ, রূপকালঙ্কার ও নিজস্ব ব্যাকরণের মাধ্যমে কবিতার ভাষা তাই ধারণাযোগ্যভাবেই বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সংলাপের আরেকটি দিক হয়ে ওঠে। সংলাপ, শব্দের মাধ্যমে ধারণার অবাধ প্রবাহ, সৃজনশীলতা ও সবপ্রবর্তনে বৈচিত্র্য। বিশ্ব কবিতা দিবস হলো ভাষা শক্তির প্রতিফলন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সৃজন শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর আহ্বান।

ইউনেস্কো প্রতি বছর ২১ মার্চ বিশ্ব কবিতা দিবস উদযাপন করে। ১৯৯৯ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর ৩০তম অধিবেশনে ২১ মার্চকে বিশ্ব কবিতা দিবস ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো কাব্যিক প্রকাশের মাধ্যমে ভাষা বৈচিত্র্যের প্রতি সমর্থন জানানো এবং বিপন্ন ভাষাগুলোকে সংশ্লিষ্ট সমাজে শুনতে পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

অধিকন্তু এই দিবসের অর্থ হলো কবিতার পৃষ্ঠপোষকতা, কবিতা আবৃত্তির বাচনিক সনাতন প্রথায় প্রত্যাবর্তন, কবিতা শিক্ষাদান এগিয়ে নেয়া, কবিতা এবং নাট্যশালা, নৃত্যকলা সঙ্গীত, চারুকলার মতো অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে একটা সংলাপ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ক্ষুদ্র প্রকাশকদের সহযোগিতা করা এবং প্রচারমাধ্যমে কবিতার একটা আকর্ষণীয় ভাবমূর্তি গড়ে তোলা, যাতে কাব্যকলা আর সেকেলে নয় বরং একটা শিল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইউনেস্কো সদস্য দেশগুলোকে জাতীয় কমিশন, এনজিও এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, পৌরসভা, কবি সমাজ, জাদুঘর, সাংস্কৃতিক সমিতি, প্রকাশনা সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি) সক্রিয় অংশগ্রহণে স্থানীয় ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে বিশ্ব কবিতা দিবস উদযাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করছে।

পটভূমি

আজকের বিশ্বে অপূর্ণ নান্দনিক চাহিদা রয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগে কবিতার সামাজিক ভূমিকা স্বীকৃত হলে এবং তা সচেতনতা জাগিয়ে তোলা ও প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে অব্যাহত থাকলে কবিতা এই চাহিদা পূরণ করতে পারে। বিগত ২০ বছরে কবিতা সম্পর্কে জোরালো আগ্রহ পুনরায় জেগে উঠেছে, বিভিন্ন সদস্য দেশে বিস্তার ঘটেছে কাব্যিক কর্মকাণ্ডের এবং বৃদ্ধি পেয়েছে কবির সংখ্যা।

এটা একটা সামাজিক চাহিদা। বিশেষ করে তরুণ শ্রেণীকে তাদের শিকড়ে ফিরে যেতে অনুপ্রাণিত করছে কবিতা। আর কবিতা এমন একটা মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে তারা নিজেদের ভেতরে তাকিয়ে দেখতে পারে এমন এক সময়ে, যখন বাইরের বিশ্ব তাদের নিজের কাছ থেকে সরে যেতে প্রলুব্ধ করছে।

অধিকন্তু কবিদের আবৃত্তিমুখর কবিতা সন্ধ্যার প্রতি জনগণের সপ্রশংস উপলব্ধি বাড়তে থাকায় ব্যক্তি হিসেবে কবি এক নতুন ভূমিকা পরিগ্রহ করছেন।

পিতৃপুরুষের মূল্যবোধের প্রতি সমাজের মোড় পরিবর্তন ও ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ও কাঠামো বিন্যাসের একটা মাধ্যম হিসেবে বাচনিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন এবং বাচনক্রিয়ার স্বীকৃতি তুলে ধরে।

কবিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা প্রচারমাধ্যম ও সর্বসাধারণের মধ্যে এখনো বিদ্যমান। এই ভাবমূর্তিকে অতীতের বিষয়ে পরিণত করা এবং সমাজে কবিতাকে যথার্থ আসন দেয়ার জন্য আমাদের মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

১৯৯৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩০তম অধিবেশনে ইউনেস্কো ২১ মার্চকে বিশ্ব কবিতা দিবস ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পূর্ব জেরুজালেমে সহিংসতায় সবাইকে শান্ত থাকতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের আহ্বান

পূর্ব জেরুজালেমে সম্প্রতি সংঘর্ষের পর মহাসচিব সব পক্ষকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা এ সংঘর্ষ নিরসনে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনকে আবারও সরাসরি আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে হবে।

পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী, ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেমে আরও এক হাজার ৬০০ নতুন বসতি স্থাপনের ঘোষণা দেওয়ায় এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বান কি মুন এবং জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে নিয়ে গঠিত কূটনৈতিক পক্ষচতুষ্টয় ইসরায়েলের এ ঘোষণার নিন্দা জানিয়েছে।

মহাসচিব নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে জোর দিয়ে বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, আবারও সরাসরি ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ওই বসতি স্থাপন অবৈধ।'

তিনি বলেন, তিন ধর্মের মানুষের কাছে পবিত্র নগরী জেরুজালেমের মর্যাদা রক্ষাই এ সমস্যা সমাধানের চূড়ান্ত পথ। 'আমি সবাইকে সংযত ও শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।'

পক্ষচতুষ্টয়ের পরবর্তী বৈঠকের জন্য বান কি-মুন মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা করবেন। সেখানে তিনি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে এ ব্যাপারে কাজ করবেন এবং সংঘর্ষ নিরসনে দুই পক্ষকে আলোচনায় বসানোর চেষ্টা করবেন।

রাশিয়ার রাজধানী থেকে তিনি ইসরায়েল ও অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে যাবেন। গাজায় অপারেশন কাস্ট লিড শেষ হওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় পার হলেও এর পুনর্গঠনে ইসরায়েল যে বাধা দিচ্ছে তা তিনি সরেজমিনে দেখবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের রকেট নিক্ষেপ বন্ধের ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী তিন সপ্তাহ ধরে গাজায় অপারেশন কাস্ট লিড পরিচালনা করেছিল।

গাজা উপত্যকাকে অবরুদ্ধ করে রাখাকে 'উল্টোফলদায়ক' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে গাজার অধিবাসীদের উন্নত জীবন ও ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, তা ছাড়া অবরোধের ফলে উদারপন্থির সংখ্যা কমে গিয়ে জঙ্গিবাদীদের উত্থান ঘটছে এবং বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়ে চোরাকারবারকে উৎসাহিত করছে।

মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন, 'এ ঘটনা দুই পক্ষেরই শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সময় এখনই।'

বোলিং আউট হাঙ্গার

ঢাকার বস্তিবাসী স্কুল শিশুদের সঙ্গে ইংল্যান্ড ক্রিকেট তারকাদের খেলা

এগারো সদস্যের ইংলিশ ক্রিকেট দল বাংলাদেশে তাদের ব্যস্ত প্রশিক্ষণসূচির মধ্যে একটু সময় নিয়ে ২০১০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঢাকার একটি প্রাইমারি স্কুলে জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লুএফসি) খাদ্য সহায়তা পুষ্ট শিশুদের দেখতে যায়।

তারকা খেলোয়াড়রা শেরে বাংলা সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের সঙ্গে কথা বলে বিকেল অতিবাহিত করেন এবং তাদের হাতে ডব্লুএফপি সমৃদ্ধ বিস্কুট তুলে দেন। এ বিস্কুট একটা পুষ্টিমান সমৃদ্ধ হালকা খাবার, যা শিশুদের ক্লাসে মনোযোগী হতে ও পড়াশোনা করতে সাহায্য করে।

ডব্লুএফপি এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে অংশীদারিত্বভিত্তিক 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে ক্রিকেট' কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এই পরিদর্শন কর্মসূচির মধ্যে ছিল কোলাহলমুখর শিশু, শিক্ষক ও অভ্যাগতদের উপভোগ করা একটি ক্রিকেট ম্যাচ ও প্রশিক্ষণ অধিবেশন।

রায়ান সাইডবটম বলেছেন, 'শিশুরা কতো উৎসাহী ও প্রাণবন্ত তা সরাসরি দেখতে পারা বড় চমকপ্রদ–এসব পুষ্টিকর বিস্কুট না থাকলে তাদের অনেকেই হয়তো স্কুলেই আসতে পারত না। রায়ান সাইডবটম শ্রীলঙ্কায়ও ডব্লুএফপির প্রকল্পগুরো পরিদর্শন করেছেন। শিশুদের ওপর ডব্লুএফপির স্কুলে খাদ্যদান কর্মসূচির একটা সত্যিকার অভিঘাত রয়েছে–এটা তাদের একটা সুন্দর ভবিষ্যতের সুযোগ দিচ্ছে।

স্কুলের অন্যতম শীর্ষ খেলোয়াড় রুহুল উত্তেজনায় ফেটে পড়ে : 'এটা একটা স্বপ্ন যা এসব ক্রিকেট তারকার সঙ্গে খেলতে পেরে পূরণ হলো আজকের দিনটি আমি কখনো ভুলব না–আর আমরা কী যে শিখেছি।' সিনিয়র ছাত্র রবিউল যে কয়েকটি কৌশল শিখেছে তার প্রশংসা করে বলে : 'আমি বিশ্বমানের একজন খেলোয়াড় হতে চাই এবং এখন আমি বুঝতে পারছি যে, এটা অর্জন করতে হলে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।'

ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে ছিল শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শন। সেখানে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা গল্পগুজব করেন এবং ছাত্রদের মধ্যে ডব্লুএফপির বিস্কুট বিতরণ করেন। প্রতিদিন উপস্থিতির জন্য একটি শিশু আটটি বিস্কুটের একটি প্যাকেট পায়। অনেক ক্ষেত্রে ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ ডব্লুএফপির এসব বিস্কুটই হয় শিশুদের দিনের প্রথম খাবার। কারণ তাদের বাবা-মা এতোই দরিদ্র যে, তারা তাদের দিনে একবারের বেশি খাবার দিতে পারে না। ডব্লুএফসির বাংলাদেশ প্রতিনিধি জন আয়লিয়েফ বলেছেন, 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইতে ডব্লুএফপির পক্ষে ব্যাট করতে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই খেলার জনপ্রিয়তা এবং শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের খ্যাতির আসন দরিদ্র ও ক্ষুধার্তদের পক্ষে তাদের শক্তিশালী প্রবক্তা করে তুলছে। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমরা আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যাশায় আছি।' ডব্লুএফপি-ইসিবি অংশীদারিত্ব ২০০৬ সালে শুরু হয়েছে–যা এই বাস্তবতাকে ব্যবহার করছে যে, ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল–তাদের অনুরাগীদের মধ্যে বিশ্বের ক্ষুধা সম্পর্কে একটা সচেতনতা জাগানোর মতো অনবদ্য অবস্থানে রয়েছে–বিশেষ করে যখন তারা এমন দেশ সফর করে যেখানে ক্ষুধার ব্যাপকতা রয়েছে। খেলা শেষে বোলিংয়ের জন্য খ্যাত স্টুয়ার্ট ব্রড বলেন, শিক্ষা দু'দিক থেকেই হয়েছে : 'সত্যিকারভাবেই এটা আমাদের জন্য ছিল একটা দৃষ্টি উন্মোচক–আমরা যখন ব্যস্ত ক্রিকেট সফরে আটকে থাকি তখন অনেক ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সহজেই আমাদের অগোচরে থেকে যায়। ডব্লুএফপির আয়োজিত এই সাক্ষাৎ বাস্তবতার একটা যাচাই যা আপনাদের উপলব্ধি করতে শেখায় যে কত সামান্যভাবে শিশুদের অপরিহার্য এই খাবারদানে সাহায্য করা যায়। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডে লায়নসের সদস্যরা গাইবান্ধায় ডব্লুএফপির স্কুলে খাদ্যদান কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। ২০০৬ সাল থেকে ইংল্যান্ড দল ও ইংল্যান্ড লায়নসের খেলোয়াড়রা ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সফরকালে ডব্লুএফপির প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করেন।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org